কল্পনা প্রশমিত হয়েছে।

**বধূ :** দেশ বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে রাখা যায় 'বধূ' কবিতাটিকে কেননা এটি রচিত হয়েছে এক বিশেষ সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। বাঙালী পরিবারের এক সমস্যা হলো কন্যার বিবাহ সমস্যা। বিয়ের পর কন্যাকে যেতে হয় শ্বশুরবাড়িতে—যেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তার অজন্মের সংস্কারকে পাশে সরিয়ে রেখে সবার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। মানিয়ে না নিতে পারার যন্ত্রণাই 'বধূ' কবিতায় বধূর জীবনে এনেছে বেদনা। এ বেদনার মূলে রয়েছে আবার ভিন্নতর পরিবেশের কারণও।

কভু বা ঝটিকা মাথার উপরে
ভেঙে পড়ে দয়াহীন।''

চতুর্থ স্তরে রয়েছে গুরুর উদ্দীপনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের উদ্দীপনার মিলন। গুরুর গভীর আহ্বানে সারা দেশের অসংখ্য মানুষ ছুটে আসে সুখ সম্পদ, মায়া মমতার বন্ধনের পরোয়া না করেই। কবির ভাষায়,—

''আয় আয় আয়' ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার—
সুখ-সম্পদ—মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে।''

তাঁর আহ্বানে ভক্তেরা এসে দলে দলে মিলছে। মিলছে তেমন করে যেভাবে সাগরে এসে মিশে যায় পঞ্চনদীর জল। সারা পঞ্জাব দশম গুরুর আহ্বানে উন্মত্তের মত হয়ে উঠেছে।

প্রথমে দু' একজন পরে দলে দলে মানুষ এসেছে গুরুর কাছে। এই আহ্বানের কোন সময় অসময় নেই। নেই প্রভাত, দ্বিপ্রহর, রাত্রির। তাই মানুষের আসারও বিরাম নেই। এবং দেখা যায় যে দশম গুরুর নির্দেশে সাধারণ মানুষ জাত্যভিমান ভুলে এক হয়ে উঠেছে,—

''যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাট বাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।''

এ কেবল কথার কথা নয়—ইতিহাসের কথা। গুরু গোবিন্দের এই উদ্দীপনা জাগরণের চিত্র রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব ছন্দ ও শব্দের বন্ধনে গ্রন্থন করেছেন। নিজেকে চেনা, জানা—কর্মের জগতে এসে পড়া—বাধাবন্ধনহীনভাবে অগ্রগমন—এবং পরিশেষে জাতিভেদের অত্যাচারের বৈষম্যের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। তবেই এ আবেগ-কল্পনা প্রশমিত হয়েছে।

**বধূ** : দেশ বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে রাখা যায় 'বধূ' কবিতাটিকে কেননা এটি রচিত হয়েছে এক বিশেষ সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। বাঙালী পরিবারের এক সমস্যা হলো কন্যার বিবাহ সমস্যা। বিয়ের পর কন্যাকে যেতে হয় শ্বশুরবাড়িতে—যেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তার অজন্মের সংস্কারকে পাশে সরিয়ে রেখে সবার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। মানিয়ে না নিতে পারার যন্ত্রণাই 'বধূ' কবিতায় বধূর জীবনে এনেছে বেদনা। এ বেদনার মূলে রয়েছে আবার ভিন্নতর পরিবেশের কারণও।

কভু বা ঝটিকা মাথার উপরে
ভেঙে পড়ে দয়াহীন।''

চতুর্থ স্তরে রয়েছে গুরুর উদ্দীপনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের উদ্দীপনার মিলন। গুরুর গভীর আহ্বানে সারা দেশের অসংখ্য মানুষ ছুটে আসে সুখ সম্পদ, মায়া মমতার বন্ধনের পরোয়া না করেই। কবির ভাষায়,—

''আয় আয় আয়' ডাকিতেছি সবে,
আসিতেছে সবে ছুটে।
বেগে খুলে যায় সব গৃহদ্বার,
ভেঙে বাহিরায় সব পরিবার—
সুখ-সম্পদ—মায়া মমতার
বন্ধন যায় টুটে।''

তাঁর আহ্বানে ভক্তেরা এসে দলে দলে মিলছে। মিলছে তেমন করে যেভাবে সাগরে এসে মিশে যায় পঞ্চনদীর জল। সারা পঞ্জাব দশম গুরুর আহ্বানে উন্মত্তের মত হয়ে উঠেছে।

প্রথমে দু' একজন পরে দলে দলে মানুষ এসেছে গুরুর কাছে। এই আহ্বানের কোন সময় অসময় নেই। নেই প্রভাত, দ্বিপ্রহর, রাত্রির। তাই মানুষের আসারও বিরাম নেই। এবং দেখা যায় যে দশম গুরুর নির্দেশে সাধারণ মানুষ জাত্যভিমান ভুলে এক হয়ে উঠেছে,—

''যত আগে চলি বেড়ে যায় লোক,
ভরে যায় ঘাট বাট।
ভুলে যায় সবে জাতি-অভিমান,
অবহেলে দেয় আপনার প্রাণ,
এক হয়ে যায় মান অপমান
ব্রাহ্মণ আর জাঠ।''

এ কেবল কথার কথা নয়—ইতিহাসের কথা। গুরু গোবিন্দের এই উদ্দীপনা জাগরণের চিত্র রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব ছন্দ ও শব্দের বন্ধনে গ্রন্থন করেছেন। নিজেকে চেনা, জানা—কর্মের জগতে এসে পড়া—বাধাবন্ধনহীনভাবে অগ্রগমন—এবং পরিশেষে জাতিভেদের অত্যাচারের বৈষম্যের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। তবেই এ আবেগ-কল্পনা প্রশমিত হয়েছে।

**বধূ** : দেশ বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে রাখা যায় 'বধূ' কবিতাটিকে কেননা এটি রচিত হয়েছে এক বিশেষ সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। বাঙালী পরিবারের এক সমস্যা হলো কন্যার বিবাহ সমস্যা। বিয়ের পর কন্যাকে যেতে হয় শ্বশুরবাড়িতে—যেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তার অজন্মের সংস্কারকে পাশে সরিয়ে রেখে সবার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। মানিয়ে না নিতে পারার যন্ত্রণাই 'বধূ' কবিতায় বধূর জীবনে এনেছে বেদনা। এ বেদনার মূলে রয়েছে আবার ভিন্নতর পরিবেশের কারণও।

অল্প বয়সে গ্রামের মেয়ের বিয়ে হয়েছে শহরে। বালিকা বধূ শহরে থাকার সময় প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করেছে তার গ্রামের পরিবেশ ও জীবনকে,—

'পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে'

এ ডাক জল আনতে যাবার ডাক—'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল জলকে চল। গ্রামের মেয়েরা বেলা পড়ে আসার সাথে সাথেই যায় কলসী কাঁধে জল আনতে—সেই অশ্বত্থতলা, সেই বাঁধা ঘাট—সেই ছায়াময় পরিবেশ—কাকচক্ষু জলে ভরা দীঘি। স্মৃতির সরণী বেয়ে বধূর সামনে এসে দাঁড়ায় যেন সেই মুহূর্ত। কলসী কাঁখে নিয়ে বধূ চলেছে আঁকাবাঁকা পথ ধরে। বাম দিকে আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ—ধূধূ করছে তা—ডান দিকে মাথা দোলাচ্ছে বাঁশের বন। অবসন্ন সন্ধ্যার আলো স্থানে স্থানে ঝলসে উঠছে দীঘির কালো জলে। সেই জলে গা ভাসিয়ে পরম তৃপ্তি পাবার স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে তার। ফেরার পথে সে এক অনুপম দৃশ্য,—

"পথে আসিতে ফিরে আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

পল্লী সৌন্দর্যের অপরূপ রূপ ফুটে উঠেছে এই অংশে। বালিকা বধূর স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে শরতে শিশির ঝলমল গ্রামের পরিবেশ—দীঘি, তীরবর্তী তালবন—আর তার পাশ দিয়ে সুদূরে আহ্বান দিতে দিতে চলে যাওয়া পথ,—

"চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।"

মুক্ত প্রকৃতির এই বিশাল বক্ষে লালিত যে বালিকা বধূ তাকে শহরের পাষাণ প্রাচীর যেন ঘিরে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পল্লীর মুক্ত প্রকৃতি বার বার বন্দিত ও ইট কাঠ কড়ি-বরগায় ঘেরা শহুরে সভ্যতা নিন্দিত হয়েছে। কবি এই নগরকে ফিরিয়ে দিয়ে ফিরে পেতে চেয়েছেন সেই অরণ্যভূমি। কিন্তু এখানে মুক্ত প্রকৃতির জন্য আর্তনাদ সরাসরি কবির নয়, বালিকা বধূর। খোলামেলা পরিবেশে মানুষ যে—সে নগর জীবনের এই বদ্ধতায় বিপন্নবোধ করেছে। কবি লিখেছেন,—

"হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া,
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া।"

কিন্তু কিভাবে চলেছে এই নিষ্পেষণ,—

"কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট
পাখির গান কই, বনের ছায়া!"

বধূটি বুঝে উঠতে পারে না তার করণীয়। কারো কাছে ব্যক্ত করতে পারে না তার মনের কথা—সর্বদাই এক ভীতি যেন তাকে তাড়িয়ে ফেরে,—

"কে যেন চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে
খুলিতে পারি মন, শুনিবে পাছে!
হেথায় বৃথা কাঁদা দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন-কাছে।'

চোখ দিয়ে তার ঝরে পড়ে জল। সবাই বিস্মিত হয়ে ওঠে। এত প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে এই শহরে বাস করেও কেনই বা ওর চোখ ভরে যায় জলে! কারণ খুঁজে না পেয়ে দোষ দেয় তারা ঐ বালিকাকেই,—

"কিছুতে নাহি তোষ এ তো বিষম দোষ
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও যে!"

শহুরে মানুষ জনের সঙ্গে, প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না ঐ পল্লীগ্রামের মুক্ত নির্জনতা প্রিয় বধূ। ঘরের কোণে বসে সে শুধু অশ্রু ঝরাতে থাকে একাকী।

বধূটির শুভার্থী যারা—তারা তার মুখ দেখে, কেউ দেহে হাত দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করে শারীরিক অবস্থা—কেউ আবার দেহের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে যায় দরাজ ভাবে। কিন্তু এ তো তার পছন্দ নয়! ব্যথিত বধূ অসহায়ভাবে উচ্চারণ করেছে,—

"ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।"

বধূটির হৃদয়ের মর্মান্তিক যন্ত্রণা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। এদেশের সমাজে নারীর অবস্থানটিও এখানে চিহ্নিত হয়েছে। নারী যাচাই করে এ সমাজ তার রূপের মাপকাঠিতে—সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই হলো। এদেশে তেমন মনের খোঁজ পায়নি বধূ যার মধ্যে রয়েছে স্নেহের অবিরল নির্ঝর ধারা।

স্নেহ ভালোবাসাহীন এই জগতে, স্বজন পরিবেষ্টিত হয়েও, একলাই যেন ঘুরতে ফিরতে থাকে বধূটি। লোকজনের অরণ্যে এই নির্জনবান তার মনকে করেছে বেদনার্ত।তার মনে হয়েছে এভাবে দিন কাটানো অসম্ভব। এখানকার মানুষদের তার মনে হয়েছে মনহীন মানুষকীট,—

"সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট—
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।"

মনের দোসরহীন এই পরিবেশে স্বাভাবিক কারণেই বেদনাহত কন্যার মনে পড়ে যায় মায়ের কথা। সামাজিক বিধানে বালিকা বয়সেই বিবাহ হয়েছে তার—তখন ছাদের উপর বসে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত পরিবেশে মায়ের কাছে শুনতো রূপকথার (উপকথা) গল্প। কন্যার মনে হয়েছে হয়তো মেয়ের বিয়ে দেবার পর এখন তিনি কন্যার বিচ্ছেদে ব্যথিত হয়ে শূন্য বিছানায় বসে অশ্রুজল ফেলেন আর নিদ্রাহীন রাত কাটান। সকালে ফুল তুলে কন্যার মঙ্গল কামনায় শিবমন্দিরে পূজো দিতে যান।

যে চাঁদ গ্রামে ছিল বধূটির নিত্য সাথী এখানেও সে চাঁদ ওঠে আকাশে। পুরনো বন্ধুত্বের সুবাদে সে এসে ঢুকতে চায় তাদের ঘরের ভেতর। বধূর মনে হয় তাকে দেশে দেশে খুঁজতে খুজতে শেষে সে এসে পৌঁচেছে এখানে। তৎক্ষণাৎ ভুল হয়ে যায় তার। কোন সামাজিক বন্ধনে এখন সে বাঁধা তা বিস্মৃত হয়ে যায় এক মুহূর্তের জন্য—দুয়ার

খুলে আহ্বান জানাতে যায় চাঁদকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সমাজনীতির প্রচণ্ড বাধা ঝড়ের বেগে আসে ছুটে,—

"অমনি চারি ধারে নয়ন উঁকি মারে
শাসন ছুটে আসে, ঝটিকা তুলি।"

বধূটি ভেঙে পড়েছে একেবারে। তার মনে হয়েছে সে কারো কাছে ভালোবাসা পাবে না এখানে—কেননা তার মনের দোসর এখানে নেই। এই যন্ত্রণাতুর জীবন থেকে অব্যাহতি পেতে চায় সে—দীঘির শীতল জলে প্রাণ জুড়তে চায় সে,—

"দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।"

কবিতাটির শেষ স্তবকে কবি ফিরে এসেছেন আবার জল আনতে যাবার আহ্বানের কথা বধূর মুখে বসিয়ে। বধূ এখানে বলেছে 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্' এ উচ্চারণে এখন যেন মেলে দুটি অর্থ—

(i) দিন শেষ হয়ে এলো এবার—সংসারের সদা প্রয়োজন যে জল তা আনতে চলো।
(ii) জীবনের শেষ হয়ে আসছে ক্রমে এখন দরকার সঞ্জীবনী সুধার অনুসন্ধান করা।

বধূটি একথা জানার জন্য ব্যাকুল,—

"কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস যদি কেহ আমায় বল্।"

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—

"এই উপসংহারটি বড় করুণ, বড় মর্মস্পর্শী, একটি নববিবাহিতা বধূর মন আনন্দে মশগুল হইয়া থাকিবার কথা; সেই বধূ একে নববিবাহিতা তায় সে বালিকা, তাহার মরণ-কামনা মনে বড় আঘাত করে।

এই বধূর পল্লীজীবনের পুরাতন স্মৃতির সহিত তুলনীয়—

"At the corner of wood street, when daylight appears,
There's a thrush that sings loud—it has sung for three years.
.....
Tis a note of enchantment; what ails her? she sees
A mountain ascending, a vision of thees;
.....
Green Pastures she views in the midst of the dale
Down which she so often has tripped with her pail;
And a single small cottage, a nest like a dove's,
The one only dwelling on earth that she loves."[১]

---

১. রবি-রশ্মি (১) / চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / পৃঃ ২১০